Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501046 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

Facets of Rabindra Nath's Personality: Pramatha Nath Bishi's 'Rabindra Prasanga'

রবীন্দ্রব্যক্তিত্বের নানাদিক: প্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ'

Dr. Bapi Dutta
Assistant Professor
Bengali Department
Acharya Prafulla Chandra Roy Government College, Siliguri

Received on: 19th May 2026
Accepted on: 29th May 2026

Abstract:

Pramathanath Bishi was one of the early residents of Santiniketan who observed Rabindranath from close quarters and grew up in his immediate presence. In his book 'Rabindranath O Santiniketan' (Rabindranath and Santiniketan), Pramathanath articulates his understanding and perception of Rabindranath—insights gained through their personal interactions. One of the key essays within this volume is 'Rabindraprasanga'. In this essay, Pramathanath vividly portrays various facets of Rabindranath's personal life and literary pursuits. The present essay, authored by me, explores and discusses the distinctive aspects of Pramathanath's portrayal of Rabindranath.

Key Words:

Rabindranath's Physical Appearance and Beauty, Description of Attire, A Personality Endowed with Divine Qualities Amidst Humanity, Industriousness, The Exhilaration of Creative Joy, Sensory Richness, The Evolution of the Nobel Laureate Poet's Personality

মূল প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ বাঙালির তথা ভারতীয়দের কাছে অতি পরিচিত ব্যক্তি। শুধু এদেশেই নয়, নোবেল প্রাপ্তির সূত্রে তিনি বিদেশেও সমান খ্যাত। উনিশ শতকের ঠাকুরবাড়ি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে ঠাকুরবাড়ির মানুষগুলির অন্তহীন অবদান রয়েছে। এই বিখ্যাত মানুষগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অন্যতম। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি কালজয়ী, সেই সঙ্গে সমাজগঠনে ও নতুন সমাজ স্থাপনে তাঁর অন্তহীন প্রচেষ্টা ছিল। শান্তিনিকেতনে আশ্রম তথা নতুন বিদ্যালয় স্থাপন সেগুলির অন্যতম। উপযুক্ত মানুষগড়ার এক দৃঢ়সংকল্প নিয়েছিলেন তিনি। নানা বাধাবিপত্তির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে সেই প্রতিষ্ঠান বিশ্বভারতী আজ বিশ্ববিখ্যাত। প্রথমযুগের সেই আশ্রমে যাঁরা পাঠগ্রহণ করেছেন, তাঁরা ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন খুব কাছ থেকে। রবীন্দ্রজীবনের বাস্তবতা তাঁদের চোখে ধরা পড়েছে নিখুঁতভাবে। অবশ্য প্রত্যেকেই যে সেটা পেরেছে তা নয়, দেখার চোখ ও উপলব্ধির মন সঙ্গে ব্যক্ত করার ভাষা যাঁদের রয়েছে তাঁরাই পেরেছেন, ব্যক্তি, কবি, শিক্ষক, মানুষ গুরুদেবের জীবনকে তুলে ধরতে। প্রমথনাথ বিশী প্রথম যুগের সেই আশ্রমিকদের একজন। শান্তিনিকেতনে

© Santiniketan Sahityapath

পড়তে এসে তিনি এখানকার জীবন ও জীবনের দেবতা রবীন্দ্রনাথকে প্রতিদিন খুব কাছ থেকে দেখে উপলব্ধি করেছেন তাঁর অনন্যতা, অন্যদের তুলনায় তাঁর অসাধারণতা। 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে প্রমথনাথ গুরুদেব ও প্রথমযুগের শান্তিনিকেতনের জীবনকে পরিপূর্ণ ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন। সাধারণত গুরুবন্দনায় ছাত্র গুণগ্রাহী হয়ে থেকে যায়, গুরুর ত্রুটি থেকে যায় অগোচরে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনকে বলতে গিয়ে তিনি তাঁর সবদিক প্রায় ছুঁয়ে গেছেন। 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ কোনো-না-কোনোভাবে এসেছে। কিন্তু 'রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ' প্রবন্ধটি ভিন্নগোত্রের। এখানে তিনি মানুষ গুরুদেবের জীবনকে সুন্দরভাবে ও বাস্তবসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

কোনো মানুষ নিখুঁত নয়। প্রতিটি মানুষের মধ্যে কিছু না কিছু খামতি-খুঁত বর্তমান। কিন্তু প্রমথনাথের মতে সৃষ্টিকর্তা রবীন্দ্রনাথকে একেবারে নিটোল-নিখুঁত-সুন্দর করে গড়েছেন। এই পরিপূর্ণতা একালের নয়, সেই সুপ্রাচীনকালের রামায়ণ-মহাভারতের যুগের মনীষীদের যে মনের অমৃতসুধা, বীরত্বের ধাতু দিয়ে গড়া হয়েছিল, বিধাতার মানবসৃষ্টির কারখানা ঘরে পড়ে থাকা সেই অমূল্য বস্তুসকলের অবশিষ্ট দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। প্রমথানাথের মতে: ''তাঁহার কেশাগ্র হইতে নখাস্ত পর্যন্ত প্রত্যেক অঙ্গাপ্রত্যঙ্গো বিধাতার শিল্পনৈপুণ্যের চরম প্রকাশ আর তাঁহার জন্মমুহূর্তে প্রত্যেক দেবতা আপনার ডালি উজাড় করিয়া দিয়াছিলেন এই নবজাত ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের ভাগ্যে।''[১] খুব সহজ কথায় সৃষ্টিকর্তা যেন তিল তিল সৌন্দর্য চয়ন ও বয়ন করে এই মানুষটির নির্মাণ করেছেন। ঠাকুরবাড়ি সেকালে তাঁদেরই আভিজাত্য-শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতি ইত্যাদির জন্য যেমন সুবিদিত ছিল, তেমনি এই বাড়ির মানুষগুলির রূপ-রঙ ছিল দেখার মতো। নারীরা তো বটেই, প্রমথনাথের মতে পুরুষদের প্রত্যেকেই ছিলেন অপূর্ব রূপবান, সুপুরুষ। এঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথই লেখকের দৃষ্টিতে সেরা: ''রবীন্দ্রনাথের সহোদরদের মধ্যে আমি দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে আমি দেখিয়াছি; তাঁহাদের রবীন্দ্রনাথের চেয়ে সুপুরুষ বলিয়া মনে হয় নাই। অবশ্য তাঁহাদের যখন দেখিয়াছি তখন তাঁহাদের বয়স বেশি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকেও তো বেশি বয়সেই দেখিয়াছি। সত্যকথা বলিতে কী, বেশি বয়সেই রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য যেন পূর্ণবিকশিত হইয়াছিল। এই সৌন্দর্যের মধ্যে বৃহৎ একটা অংশ ছিল প্রতিভার জ্যোতি।''[২] নারীর লাবণ্য কৈশোরে প্রকাশিত, যৌবনে পূর্ণ বিকশিত, কিন্তু পুরুষের পৌরুষ যেন বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গো সঙ্গো আরো পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে থাকে। প্রমথনাথ রবীন্দ্রনাথের রূপসৌন্দর্যের সেই দিকেই নির্দেশ করেছেন। এই সৌন্দর্য অতীব আকর্ষণীয়। যার দিকে নির্নিমেষ চেয়ে থাকতে হয়; মহিমান্বিত, যা বিরাটত্বকে প্রকাশ করে চলে এবং প্রচণ্ড এক রাজকীয় ক্ষমতার জন্য ভীতিকর, ভুল-ভ্রান্তি হলে যেন দণ্ডদানে অবিচল।

পোশাক প্রয়োজনের সামগ্রী। গড়পড়তা সাধারণ মানুষ জামাকাপড় পরে প্রয়োজনের খাতিরে। 'জীবনস্মৃতি'র পাতায় দেখা গেছে ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েদেরও খাদ্য ও পোশাকের আয়োজন ছিল সামান্য। কিন্তু সময় ও জীবনের পর্বান্তরের সঙ্গো সঙ্গো নতুন-অনন্য বিষয়কে গ্রহণে এঁদের আগ্রহের অন্ত ছিল না। তাই অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো ঠাকুরবাড়ির পোশাকও বিশ্ববিখ্যাত। আসলে সাধারণ জীবনযাপনের মধ্যে দিয়ে উন্নত জীবনদর্শন ছেলেমেয়েদের মধ্যে গেঁথে দিয়ে চেয়েছিলেন মহর্ষি। সেই মহৎ জীবনশিক্ষা রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন এবং পরিণত বয়সে ব্যক্তিত্বের সঙ্গো মানানসই পোশাক পরিধান করতেন রবীন্দ্রনাথ। প্রমথনাথ রবীন্দ্রনাথের পোশাক সম্পর্কে জানিয়েছেন: ''সাধারণত তিনি পায়জামা ও ঢিলে জামা পরিতেন; উৎসবাদি উপলক্ষে গরদের ধুতি চাদর পাঞ্জাবি; আর বিদেশভ্রমণে তাঁহার মাথার উঁচু টুপি এখন বিশ্ববিখ্যাত। ইহা তো কেবল স্থূলভাবে বলা হইল, যেরকম পোশাকই তিনি পরুন না কেন তাহাতেই তাঁহাকে অতি সুন্দর দেখাইত।''[৩] ক্ষেত্রবিশেষে পোশাকের সৌন্দর্য ব্যক্তিকে ছাপিয়ে বড়ো হয়ে ওঠে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তা উল্টো, পোশাক তাকে নয়, বরং তিনিই যেন পোশাককে সার্থকতা দিতেন।

প্রমথনাথ রবীন্দ্রনাথকে অনেকটাই ঐশ্বরিক গুণ ও মহিমায় ভূষিত করেছেন। কিন্তু তিনি জানেন মর্ত্যভূমিতে জন্মানো মানুষ কখনো মানবিক গুণাবলির সম্পূর্ণ উর্ধ্বে উঠতে পারে না, তা অসম্ভব। সেই স্বাভাবিক বোধ থেকেই প্রমথনাথ রবীন্দ্রনাথের মানবিক গুণাবলীর কথা বলেছেন। সেখানে তাঁর রাগ-বিরাগ, তীব্র সচেতনতা, অনন্য মানবপ্রেম, অস্থিরতা এবং স্থৈর্য সবই উঠে এসেছে। সাধারণত শান্তস্বভাব রবীন্দ্রনাথের রাগের ভঙ্গিটি অসাধারণ: ''ভ্রুযুগ আকৃষ্ট হইয়া প্রায় সংযুক্ত হইত, মাঝখানে দুটি ঊর্ধ্বগামী রেখাপাত করিত, মুখ ঈষৎ রক্তাভ হইয়া উঠিত, হাত দুখানি কোলের ওপর পরিয়া থাকিত, আর চোখের দৃষ্টি মাঠের অপর প্রান্তে দিগন্তের দিকে বিন্যস্ত হইয়া সবশুদ্ধ কেমন একটা নৈর্ব্যক্তিক ভাব ধারণ করিত। কোনো রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিতেন না, করিলে বোধ করি এমন ভয়াবহ

© Santiniketan Sahityapath

হইত না, বাক্যের অভাবেই তাঁহার বিরক্তি প্রকাশ পাইত — একটা-দুটা অর্ধোক্ত বাক্যাংশ মাত্র।"[৪] প্রকাশই যাঁর কাছে কবিত্ব, নিয়ত ভাষা দিয়ে সাহিত্যের মালা গাঁথাই যার চিরস্বভাব, তাঁর এমন নির্বাক ক্রোধ অবশ্যই অপরপক্ষের কাছে ভীতিকর। সাহিত্য সৃষ্টিক্ষম প্রমথনাথ রবীন্দ্রনাথের মনোমত যাত্রা রচনায় অনুত্তীর্ণ হয়ে বকা খেয়েছেন। এমনকি একবার অন্যের ভুলের জন্য শিষ্যকে গুরুর কটুবাক্য শুনতে হয়েছে। শিষ্য গুরুর ভুল ভাঙালে গুরু প্রসন্ন। ক্রোধ যে মানুষের শত্রু, স্বাভাবিক চিন্তার বিনাশ ঘটায় এবং শ্রোতাকে কষ্ট দেয়, তা রবীন্দ্রনাথ জানতেন ও মানতেন। অতি নিকটজন প্রমথনাথ গুরুদেবের মানবপ্রেম সম্পর্কে সচেতন। গুরুর বাহ্য ক্রোধের অন্তরালে লুকিয়ে থাকে স্নেহের ফল্গুধারা তাঁকে চিরসিঞ্চিত করেছে, কিন্তু দোষী ব্যক্তি যদি না বুঝে কষ্ট পেত, তাহলে তার যাতনার ভার সইতে হতো রবীন্দ্রনাথকেই। এমন মানবস্নেহের ধারা গুরুদেবের অন্তরে সদাবহমান ছিল।

কবিগুরু অতিবিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, সাধারণের দৃষ্টিতে সকলের ধরাছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু প্রমথনাথের মতে, এই ভাবনা অসার। কর্মব্যস্ত রবীন্দ্রনাথ সদাই কোনো-না-কোনো কাজে ব্যাপৃত থাকতেন, সাহিত্যরচনা, শিক্ষাদান বা সমাজসেবা। কিন্তু দর্শনার্থীদের ফেরান নি কখনো। প্রমথনাথ সর্বদা তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছেন। লেখার কাজে ব্যস্ত থাকলে বাক্যাংশ শেষ করে ছাত্রকে সময় দিয়েছেন। এমনকি বাইরে থেকে আসা প্রজাকে সময় দিয়েছেন চূড়ান্ত ব্যস্ততার মধ্যে। সৃষ্টি-খ্যাতি-সাফল্যের যে উচ্চ সিংহাসনে তিনি আরোহণ করতেন বা তাঁর প্রাপ্য ছিল, সেখান থেকে নিম্নে অবস্থিত মানুষকে তিনি কখনো হেয় করেন নি। মানুষ তাঁর কাছে মানুষই, তাঁর অবস্থান বা আগমনের সময় যাই হোক না কেন।

'জীবনস্মৃতি' থেকে জানা যায় ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যন্ত চঞ্চল। 'ইচ্ছাপূরণ', 'অতিথি', 'সমাপ্তি' গল্পের বালক-বালিকারা শুধু তাঁর চোখে দেখা নয়, কিছুটা যেন তাঁর বাল্যকালের সেই চঞ্চলচিত্ত শিশু-কিশোর। প্রমথনাথ পরিণত রবীন্দ্রনাথকে সৃষ্টিকে পূর্ণরূপ দেবার জন্যও অনেকস্ময় এমন চঞ্চল হতে দেখেছেন: "আমি আমবাগানের মধ্য দিয়া কোথাও যাইতেছিলাম, হঠাৎ দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ সবেগে আসিতেছেন; এতই ত্বরা যে, পথ দিয়া চলিবার সময় নাই বলিয়াই মাঠ ভাঙ্গিয়া চলিয়াছেন; সম্মুখেই পড়িল মেহেদিগাছের বেড়া, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ঠেলিয়া চলিয়া আসিলেন; অদূরে দাঁড়াইয়া শুনিলাম গুণ গুণ করিয়া গানের দুটি পদ আবৃত্তি করিতেছেন... ব্যাপার কী বুঝিতে বিলম্ব হইল না। এই গানটি তখনি রচনা করিয়া সুর দিয়াছেন; ভুলিয়া যাইবার আগেই গানটি দীনেন্দ্রনাথকে শিখাইয়া দিবার জন্য ছুটিয়া চলিয়েছেন।"[৫] আবার এই মানুষটিই অতিশয় ধীর-স্থির। কোনো সভা চলাকালে তিনি একাসনে উপবিষ্ট হয়ে একই শরীরসংস্থানে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে দিতেন: "রবীন্দ্রনাথের শারিরিক সহিষ্ণুতাও অসীম ছিল। সভাস্থলে উপবিষ্ট হইয়া একাসনে দীর্ঘকাল কাটাইয়া দিতেন, কখনো তাঁহাকে শরীরসংস্থান পরিবর্তন করিতে দেখি নাই। তাঁহার চেয়ে বয়সে যাহারা অনেক কম তাহারা সে সময়ের মধ্যে কতবার যে আসন পরিবর্তন করিতেন তাঁহার ঠিক নেই।"[৬]

প্রমথনাথ প্রতিভাবান ব্যক্তিদের একটি বিশেষ ক্ষমতার কথা বলেছেন, সেটি হলো ইন্দ্রিয়শক্তি। পঞ্চইন্দ্রিয় তাদের সমান সক্ষম এবং প্রতি ইন্দ্রিয় পূর্ণরূপে কর্মক্ষম। জগতের রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ তাদের কাছে ভিন্ন মাত্রা পেয়ে থাকে, তাতেই তাদের হাতে জগতের অন্য এক রূপ নির্মিত হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের এই অনন্য ক্ষমতা ছিল। ষাট বছর বয়সে তাঁর চোখের দৃষ্টি ছিল প্রখর। দূরাগত তালপত্রের মর্মর তাঁর সঙ্গী এক তরুণের কানে পৌঁছায় না, কিন্তু তিনি অনায়াসে শুনে ফেলেন। আশ্রমের ফুলের বিকাশ, পত্রের বিন্যাস সমস্তই তাঁর দৃষ্টির অধীন। প্রমথনাথ জানাইয়েছেন: "যখন তাঁহার বয়স ষাটের উপরে তখনো দেখিয়াছি পূর্ণিমার আলোতে বিনা চশমায় ছাপানো কবিতার বই পরিয়া শুনাইতেছেন। উত্তরায়ণের উত্তর দিকে কিছু দূরে একটি তালগাছ আছে। শীতের সকালবেলায় উত্তরে-বাতাসে সেই তালের পাতায় মৃদু রব উঠিতেছিল, আমি সেখানে বসিয়াছিলাম — আমার কানে কোনো মতেই ধরা পড়িল না। রবীন্দ্রনাথ শুনিতে পাইলেন, তাঁহার নির্দেশের পরে আমি তাহা শুনিতে পাইলাম।"[৭] আশ্রমের সামান্যতম ফুল, লতা পাতা সবকিছুকেই তিনি দেখেছেন, সমান গুরুত্ব দিয়ে স্থান দিয়েছেন তাঁর কাব্যে। তবে কবি রবীন্দ্রনাথ শব্দজগৎ ও দৃষ্টিজগতের মধ্যে প্রথমটির অনুগামী। দেখার চেয়ে শব্দের ওপরই তাই টান বেশি। তিনি নিজেই জানিয়েছেন: "একদিন কথায় কথায় তিনি বলিয়াছিলেন, শব্দজগৎ ও দৃষ্টিজগতের মধ্যে একটাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলে তিনি চোখের দৃষ্টি ছাড়িতে রাজি আছেন। কথাটা আমার মনে রহিয়া গিয়াছে এবং এই সত্যের আলোয় তাঁহার কাব্য বুঝিবার সুবিধা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের জগৎ বাণীময়; এই বাণীর সঙ্গে তাঁহার বাণী-বিনিময়; প্রকৃতির সঙ্গে মানবভাষায় নিরন্তর তাঁহার উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিতেছে...।"[৮]

© Santiniketan Sahityapath

রবীন্দ্রচরিত্র ও ব্যক্তিত্বের আলোচনা করতে গিয়ে প্রমথনাথ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন, সেটি হলো প্রাক্-পঞ্চাশ ও পঞ্চাশোত্তর রবীন্দ্রচরিত্রের পরিবর্তন। বিরূপ সমালোচকেরা এ ব্যাপারে কবির নোবেল প্রাপ্তি এবং তজ্জনিত অহমিকাবোধের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রমথনাথ খুব নিবিড়ভাবে লক্ষ করে এর সম্পূর্ণ এক অন্য কারণ নির্দেশ করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি জার্মান কবি গ্যেটের প্রসঙ্গো এনে বলেছেন, ইটালি যাত্রা কবি গ্যেটের মধ্যে এক অভাবনীয় পরিবর্তন এনেছিল। ক্লাসিকাল শিল্পদর্শন ও তার নিবিড় অনুভব গ্যেটেকে বিবিক্ত, নৈর্ব্যক্তিক, শীতল অহংকারে নির্লিপ্ত করে দিয়েছিল। একইভাবে পঞ্চাশোত্তর রবীন্দ্রনাথ দু-বছর ইউরোপ ও আমেরিকায় কাটিয়েছেন, দেখেছেন সেখানকার 'জাতিধর্মসম্প্রদায়মুক্ত মানব'। এই নবতর জীবন দর্শনের ফলে তাঁর প্রতিভার অন্যতর বিকাশ সাধিত হয়েছে। তাঁর ভারতীয় শান্ত জীবনাদর্শ পুনরায় প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ নোবেলপ্রাপ্তি নয়, এই ভ্রমণই কবির সৃষ্টিমুখকে ভিন্নধারায় প্রবাহিত করেছে।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যের আলোচনা নিয়ে গ্রন্থের অভাব নেই। রবীন্দ্রনাথকে স্বচক্ষে দেখে বা তাঁর জীবন ও সাহিত্যের নিবিড় পাঠগ্রহণ করেই এসব গ্রন্থ রচিত। তবে প্রমথনাথ যেহেতু সরাসরি রবীন্দ্রনাথের ছাত্র এবং অনেকটা দীর্ঘ সময় শিক্ষাগ্রহণ, সাহিত্যচর্চা ও আলোচনা, নাট্যরচনা ও অভিনয় ইত্যাদি নানা সূত্রে কবির সঙ্গো কাটিয়েছেন, তাতে তাঁর উপলব্ধির মধ্যে এসেছে অনেক বেশি বস্তুনিষ্ঠা। 'রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ' প্রবন্ধটিতে তিনি স্তরে স্তরে কবির ব্যক্তিত্বের নানা দিক আলোকিত করেছেন। ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের নির্মাণরূপ, স্টাইল যেমন তিনি ধরেছেন, তেমনি এনেছেন তাঁর রাগ, সচেতনতা, মানবপ্রেম, অস্থিরতা এবং স্থৈর্যপ্রসঙ্গ। প্রমথনাথ যেন বলতে চেয়েছেন, বিধাতা রবীন্দ্রনাথকে অনন্য করেই গড়েছেন, তাঁর উপমা একমাত্র তিনি নিজেই। এই অনন্যতার কারণে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি শতধারায় প্রবাহিত এবং অসাধারণ। ব্যক্তিত্বের সঙ্গো এভাবেই খুব সহজে তিনি সৃষ্টিকে মিলিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন পঞ্চাশোর্ধ রবীন্দ্রনাথের বিদেশভ্রমণ এবং সেই সূত্রে সৃষ্টিধারার গতিমুখ পরিবর্তনের কথা। আসলে 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' গুরুর চরণে শিষ্যের অর্ঘ্যপ্রদান। গুরুর ব্যক্তিত্বের বিশেষ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক 'রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ' প্রবন্ধে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

তথ্যসূত্র:

১। 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন', প্রমথনাথ বিশী, বিশ্বভারতী, আষাঢ় ১৩৫১, পৃ. ১২৮
২। ওই
৩। ওই, পৃ. ১২৯
৪। ওই, পৃ. ১২৯-১৩০
৫। ওই, পৃ. ১৩১-১৩২
৬। ওই, পৃ. ১৩৩
৭। ওই
৮। ওই

—

© Santiniketan Sahityapath